বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

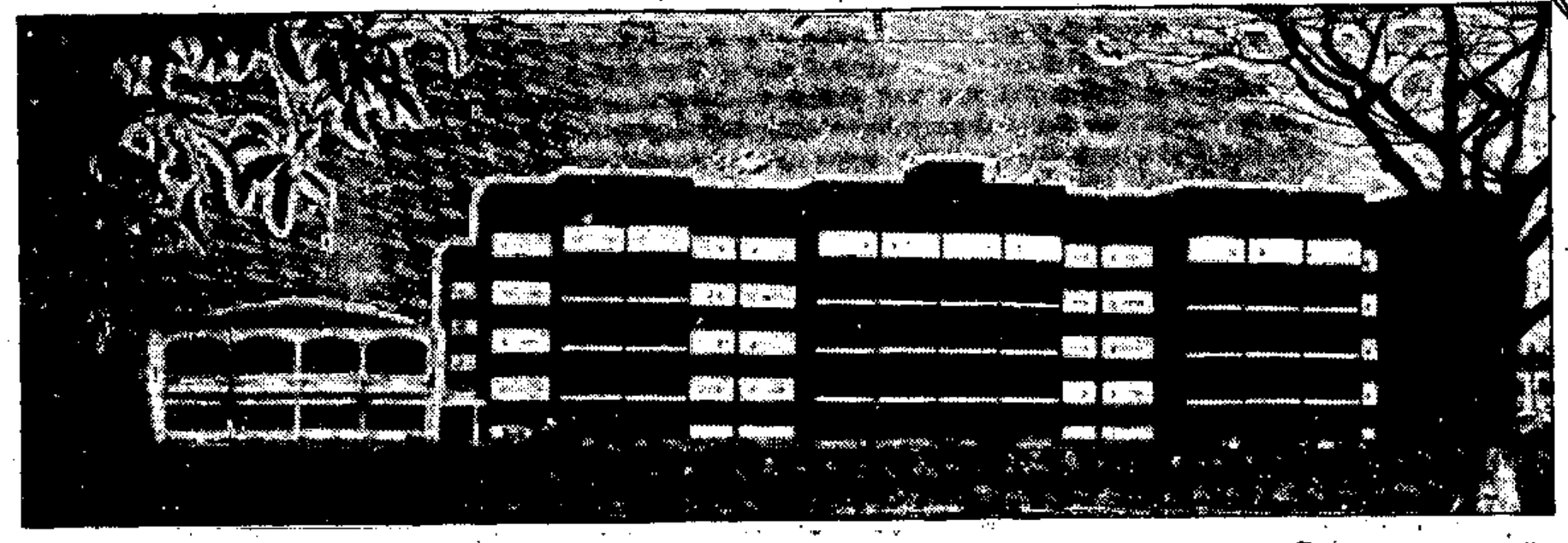

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর। ইতোমধ্যে। বাউবি সম্পর্কে সমাজে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং যেভাবে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী ক্রমবর্ধমান হারে এর সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তাতে এ শিক্ষায়তনটিকে নির্দ্বিধায় একটি যুগোপযোগী অপরিহার্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করা যায়।

আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত না হলেও যে একেবারে নগণ্য নয় তা বলার অপেক্ষা

ডঃ আবদুল আউয়াল খান

রাখে না। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সবই আছে, ছাত্র-শিক্ষকও রয়েছে যথেষ্ট সংখ্যক। বইয়ের লাইব্রেরী বা বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিও যে একেবারে নেই তা নয়। 'এ্যাডমিশন', 'ইলেকশন' বা 'এক্সামিনেশন'—এর কোনটিই বাদ যাচ্ছে না একটুও; কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 'এডুকেশন' যে একেবারে নির্বাসিত হবার পথে তা কি অস্বীকার করার আর উপায় আছে?

দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যেন একটি রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের রাহুগ্রাসে নিপতিত। সকল রাজনৈতিক দলই যেন দীর্ঘদিন যাবত লিপ্ত রয়েছে একটি ঘৃণ্য চক্রান্তে, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা। ফলশ্রুতিতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই আজ দিশাহারা। শিক্ষকরা ছিটকে পড়েছেন তাঁদের সুমহান ব্রত থেকে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরিবর্তে তাঁদের অনেকেই পরিণত হয়েছেন গৃহশিক্ষকে। নামকরা স্কুল-কলেজের অনেক শিক্ষকই সুযোগ বুঝে নিজ নিজ 'গৃহকে পরিণত করেছেন টিউটোরিয়াল সেন্টারে। টাকার বিনিময়ে শিক্ষাদান করতে গিয়ে তাঁরা যেমন একদিকে পরিণত হয়েছেন ব্যবসায়ীতে অপরদিকে আর্থিকভাবে পিষ্ট হচ্ছেন অভিভাবকবৃন্দ। তাঁদেরকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের জন্য ক্রয় করতে হচ্ছে বিদ্যা নামক অমূল্য ধন। প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে এভাবে কত নিম্নবিত্তের অভিভাবক যে পিষ্ট হচ্ছেন আর্থিকভাবে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাইভেট টিউটরদের বাসায় ছোটাছুটি করতে গলদ্ঘর্ম হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। এতে অনেকেই পঙ্গু হয়ে পড়ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে না হয় রীতিমতো ক্লাস, না হয় ঠিক সময়ে পরীক্ষা। খুবই অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করছে জ্ঞান পিপাসুশিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। বাংলাদেশের কনভেনশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাই বহু পূর্বেই হয়েছে লক্ষ্যচ্যুত।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ এর নিজস্ব কোন ক্যাম্পাস নেই; যে কারণে এর নেই কোন ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স। এর শিক্ষার্থী রয়েছে দেশব্যাপী। বয়স, পেশা বা আর্থিক সামর্থ্য নির্বিশেষে যে কোন পুরুষ বা মহিলা হতে পারে এর 'ছাত্রছাত্রী'। যথোপযুক্ত বই, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, টিভি ও রেডিও প্রোগ্রাম, টিউটোরিয়াল সার্ভিসেস ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান পিপাসা মিটানোর যে ব্যবস্থা রয়েছে তাঁর পাশাপাশি ইন্টারনেট, টেলি ও টিভি কনফারেনসিং ইত্যাদির সুযোগও বাউবি করে দেবে অদূর ভবিষ্যতে। বস্তুত শিক্ষার্থী যে কোন পেশায়ই নিয়োজিত থাকুক না কেন অবসর সময়ে বা বন্ধের দিনে চিত্তবিনোদনের অংশ হিসাবেই সে জ্ঞান অর্জনের নিশ্চয়তা পেতে পারে বাউবি থেকে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে। উপাচার্য প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বাউবির শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে কিছুটা গুণগত পরিবর্তনের শুভসূচনা সাধিত হবে তা কিছুটা জোর দিয়েই বলা যায়। বস্তুত বাউবির প্রতি যদি কর্তৃপক্ষীয় শুভ দৃষ্টির ঘাটতি না হয় তা হলে অচিরেই এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশ্বাস।

আর্থিক দিক থেকেও বাউবি আমাদের দেশের জন্য খুবই যুগোপযোগী একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারী সাহায্যপুষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বাউবির ছাত্রছাত্রীদের জন্য গড়পরতা মাথাপিছু ব্যয় হচ্ছে মাত্র এক পঞ্চমাংশ (২০%)। ট্যাক্স-পেয়ারদের অর্থ বা ছাত্রছাত্রীদের সময়ের অপচয় এখানে খুবই কম। অধিকন্তু দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাউবির কোন কোন প্রোগ্রাম শুধু সামাজিক দিক থেকেই নয়, আর্থিক দিক থেকেও লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যায়। বিজনেস স্কুলের প্রোগ্রামগুলো এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর জন্য সরকারের ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ যে বেশি হতে পারে তা কোন অলীক কল্পনা নয়, বাস্তবতা মাত্র। তাই সরকারের উচিত বাউবির উন্নয়ন ও প্রসারে সর্বাত্মক সহায়তাদান। এতে একদিকে যেমন দেশে শিক্ষার প্রসার হবে দ্রুত ঠিক অন্যদিকে সরকারী অর্থের অপচয়ও কমে যাবে বহুগুণে। বস্তুত বাউবি হচ্ছে এদেশের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বিনিয়োগের একটি সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। একটি আদর্শ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর ক্রমোন্নয়নে এগিয়ে আসা উচিত সকলকেই।